Department of Patents, Designs and Trade Marks

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI)

স্বাক্ষরিত

JOURNAL

November, 2020

GI Journal No. 07

Published on :

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি রেজিস্ট্রার বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। **কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ**

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। **আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ**

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ**

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৩৪
আবেদনের তারিখ : ১১-০৭-২০১৯

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), ঢাকা কর্তৃক আবেদনকৃত আবেদন নং-৩৪ এর অধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "রংপুরের শতরঞ্জি" যা শ্রেণি ২৭ এর অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম ঃ "রংপুরের শতরঞ্জি"

শ্রেণি ঃ ২৭

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), ঢাকা।

খ) ঠিকানা ঃ ১৩৭/১৩৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গ)ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ রংপুরের শতরঞ্জি উৎপাদনকারীগণের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। পরবর্তীতে চাহিদা অনুযায়ী আরো উৎপাদনকারীগণের নাম তালিকায় সংযোজন হতে পারে।

ঘ) প্রকারঃ ০৩ (তিন) প্রকার। যথা ঃ

০১) সুতি সুতা দ্বারা তৈরি;
০২) মখমল সুতা দ্বারা তৈরি এবং
০৩) পাটের সুতা দ্বারা তৈরি।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ **১। এটি সম্পূর্ণ হাতে বুনা হয়।**

২। অনন্য বুনন কৌশল।
৩। কোন জোড়া ছাড়া যে কোন মাপের শতরঞ্জি তৈরি করা যায়।
৪। বিভিন্ন আকর্ষণীয় ডিজাইনে শতরঞ্জি তৈরি করা যায়।
৫। বিভিন্ন রং এর সুতা দিয়ে শতরঞ্জি তৈরি করা হয়ে থাকে।
৬। শতরঞ্জি ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে বিবেচিত এবং পরিচিত।
৭। রংপুরের ঘাঘট নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার জলবায়ু শতরঞ্জি বুনার উপযোগী।
৮। ঘাঘট নদীর পানির সাথে রং মিশিয়ে কটন সুতা ও পাটের সুতা রং করা হয়, যার ফলে রঙের স্থায়ীত্ব অনেক বেশি থাকে।
৯। এতদিন ভেষজ রং (Vegetable dye) ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে রাসায়নিক রং (Chemical dye) বেশী ব্যবহার করা হয়।
১০। শতরঞ্জি ডিজাইন হাতে বুনা হয় যার ফলে দুই পাশ থেকে ডিজাইন বা নকশা সমানভাবে লক্ষণীয় এবং এর কোন উল্টো-সোজা নেই।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনার পূর্বে এর ঐতিহ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি আলোকপাত করা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। অঞ্চলভেদে এর যেমন রয়েছে বিচিত্রতা, তেমনি রয়েছে ভিন্নতা। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর কারুশিল্পগুলোর মধ্যে শতরঞ্জি অন্যতম।

শত শত বছর পূর্ব থেকে রংপুর জেলার তাঁতিরা এক ধরনের মোটা কাপড় তৈরি করে আসছে যা শতরঞ্জি নামে পরিচিত। শতরঞ্জি বা ডুরি মূলত: এক প্রকার কার্পেট। একসময় সমাজের অভিজাত শ্রেণির মানুষের গৃহে, বাংলো বা খাজাঞ্চিখানায় বিশেষ আসন হিসেবে শতরঞ্জি ব্যবহৃত হত। বর্তমানে আধুনিক সমাজে এর বহুল ব্যবহারের প্রচলন ঘটলেও এখনো সমাজের আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে শতরঞ্জি ব্যবহৃত হচ্ছে।

সময় ও চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও রুচির বিচিত্রতা এসেছে। শুরুতে শতরঞ্জি নামে শুধু কার্পেট জাতীয় পণ্য তৈরি হতো। বর্তমানে উদ্যোক্তারা ফ্লোরম্যাট, ওয়ালম্যাট, মানিব্যাগ, পাপোষ, জায়নামাজ, ঘরের মেঝের কার্পেট, স্কুলব্যাগ, পার্টস, মোবাইল ব্যাগ ইত্যাদি পণ্য তৈরি করছে।

স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলাদেশ কারুশিল্পের জন্য গর্বিত। কারুশিল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ এবং চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহুকাল ধরে এ শিল্প বাঙালির ঐতিহ্যকে ধারণ করে আসছে। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা উপকরণ দিয়ে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই নিজের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখে। রঙ-বেরঙের সুতা, প্রকৃতি নির্ভর গ্রামীণ নকশায় কারুশিল্পীদের সুনিপুণ হাতে তৈরি হয় শতরঞ্জি। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নান্দনিক রূপ ও বৈচিত্রের এক অনবদ্য সৃষ্টি শতরঞ্জি। অতিসাধারণ উপাদানে কারুশিল্পীদের মনের মাধুরী মেশানো রঙের বহুবিদ ব্যবহার ও কারুকাজের সমন্বয়ে শতরঞ্জি শিল্প প্রস্ফুটিত। পুরোপুরি দেশীয় প্রযুক্তিতে বাঁশের অতি সাধারণ যন্ত্র ও তাঁত শতরঞ্জি উৎপাদনে ব্যবহার হয়ে থাকে। বয়ন কৌশলের দিক দিয়ে শতরঞ্জি আধুনিক ট্যাপেস্ট্রির (Tapestry) অনুরূপ একটি শিল্প।

শতরঞ্জি শব্দের অর্থ রঙের বাহার, কারো কারো মতে সতের রকমের রঙ ব্যবহারের কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে শতরঞ্জি। সাধারণত তিন প্রকারের শতরঞ্জি তৈরি হয় : সুতি (cotton), মখমল (woollen) ও পাটের (jute) তৈরি। সুতি শতরঞ্জি শতভাগ কার্পাস তুলার সুতা দিয়ে, দ্বিতীয়টি পাটের সুতা ও উলের সংমিশ্রণে মোটা মখমল দিয়ে এবং তৃতীয়টি পাটের সুতা দিয়ে তৈরি হয়। শতরঞ্জি আবার দুই ধরনের মোটিফে (Motif) বুনন করা হয়। একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নকশা এবং অপরটি আধুনিক নকশা। প্রাচীন নকশাগুলোর মধ্যে যেমন হাতির পা, জাফরি, ইটকাঠি, নাটাই, রাজা-রাণী, দেব-দেবী, প্রজাপতি, ঘুড়ি, নারীর মুখ, পশুপাখি, রাখাল বালক, কলসী কাঁখে রমণী, পৌরাণিক চরিত্র, গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি রয়েছে। আধুনিক মোটিফে আছে উর্বরতা ও প্রবৃদ্ধির প্রতীক, পুষ্পিতপাতা, পানপাতা, ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনার স্বাক্ষর স্বরূপ কাবাঘর, মসজিদ, মিনার ইত্যাদি। এছাড়াও জীবন-জীবিকার প্রতীক মাছ, পাখি, নৌকা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চিত্র ইত্যাদি। আধুনিক নকশার ক্ষেত্রে বিবি রাসেলের উদ্ভাবিত নকশাও উল্লেখযোগ্য। শতরঞ্জির বয়নশৈলী এবং এর নান্দনিক রূপ ও বৈচিত্র্যের কারণেই দেশ-বিদেশে ক্রমান্বয়ে এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৬ থেকে ৯টি রঙের ৪০ থেকে ৪৫টি ডিজাইনের শতরঞ্জি বাজারে পাওয়া যায়। রংপুরের শতরঞ্জি পণ্যের উৎপাদন উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। অবাধ বাণিজ্য ও তুমুল প্রতিযোগিতার বাজারে রংপুরের শতরঞ্জি বর্তমানে বিশ্বের ৩৬টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। কালের আবর্তে অনেক কারুশিল্প হারিয়ে গেলেও শতরঞ্জি শিল্প বহুকাল থেকে আপন ঐতিহ্য নিয়ে শুধু টিকে আছে তাই নয়, বর্তমানে এর নকশা ও নান্দনিকতা এবং আধুনিকতার কারণে এই শিল্পটির ভবিষৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে।

ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদনের এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

বাংলাদেশের রংপুর জেলা শতরঞ্জি শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ১৯১২ সালে প্রকাশিত রংপুর গেজেটিয়ারে ইতিহাসবিদ উইলিয়াম হান্টার উল্লেখ করেন ১৮৩০ সালে রংপুর জেলা কালেক্টর মিঃ নিশবেত এ অঞ্চলে শতরঞ্জি নির্মাণ শৈলী দেখে মুগ্ধ হন এবং এ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর নানারকম সহায়তায় রংপুর শহর থেকে ০৫ কিলোমিটার দূরে গড়ে উঠেছে এ বয়ন শিল্প। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ গ্রামের নাম রাখা হয় নিশবেতগঞ্জ। স্থানীয় তথ্য মতে এখানে বড় আকারের রং-বেরঙের গালিচা বা শতরঞ্জি তৈরি হতো। 'পিলপায়া' (হাতির পা) নামে এক প্রকার শতরঞ্জি ছিল যা শুধু রংপুরেই তৈরি হতো। আরেক তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৭৩৬ সালে রংপুরের পীরজাদাপুর, রাধাকৃষ্ণপুর, দামোদরপুরে শতরঞ্জি তৈরি শুরু হয়। শৈল্পিক কারুকার্য মন্ডিত শতরঞ্জি দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় হওয়ায় এর কদর ক্রমেই বাড়তে থাকে। বর্তমানে রংপুরের বেশ কয়েকটি এলাকায় এবং বিভিন্ন জেলাতেও গড়ে উঠছে শতরঞ্জি

কারখানা। রংপুর শহরের উপকণ্ঠে ঘাঘট নদীর তীরে কয়েকটি গ্রামে এই শতরঞ্জির উৎপাদন হয়। ভৌগোলিক আবহাওয়া জনিত কারণে রংপুরের ঘাঘট নদীর পানি শতরঞ্জি সুতার রঙের উপযোগী, যেমন উপযোগী জামদানির জন্য শীতলক্ষ্যা নদীর পানি। যতদূর জানা যায়, রংপুরের আবহাওয়া ও জলবায়ু তথা প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণেই রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের কারুশিল্প গড়ে উঠেছে শত শত বছর পূর্বে। রংপুরে রবার্টসন এলাকায় 'কারুপণ্য রংপুর লিঃ' এই নামে শতরঞ্জি উৎপাদন হচ্ছে। প্রায় ৫০০ শ্রমিক ও কারিগর এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। রংপুরের নিশবেতগঞ্জ ও রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে ৬৬০ জন তাঁতীকে শতরঞ্জি তৈরির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪৫৩ জন তাঁতীকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়নে বিসিকের তত্ত্বাবধানে রংপুরে ২০১১ সাল থেকে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ অব্যাহত আছে। রংপুরের নিশবেতগঞ্জে নতুন উদ্যমে বাড়ি বাড়ি তৈরি হচ্ছে শতরঞ্জি। নিশবেতগঞ্জের শতরঞ্জি পল্লী এবং রংপুরের রবার্টসন এলাকার 'কারুপণ্য রংপুর লিঃ' মিলে যেন এটি এক বিশাল শতরঞ্জি কারুপল্লীতে পরিণত হয়েছে। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'আইকা' ও 'বিবি রাসেল' এর উদ্যোগে রংপুরের পীরগাছা উপজেলা মাছকুটি গ্রামে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শতরঞ্জি কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সময়কে ধারণ করে আপন বৈশিষ্ট্যকে আরো উজ্জ্বল করতে নিশবেতগঞ্জ থেকে মোংলাকাটি গ্রামেও পাড়ি জমিয়েছে শতরঞ্জি শিল্প। উল্লেখ্য প্রতি বছর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণ কারুশিল্প সামগ্রী রপ্তানি করা হয় তার ৫০ ভাগই শতরঞ্জি। বছরে আয় হচ্ছে প্রায় ৪০ লাখ মার্কিন ডলার। এই কৃতিত্বের দাবিদার রংপুর অঞ্চলের প্রায় পাঁচ হাজার নিবেদিতপ্রাণ কর্মী, যাদের ৯০ শতাংশ নারী কর্মী। এই কারুপণ্যের সাথে জড়িয়ে আছে ২০ থেকে ২২ হাজার মানুষের জীবন। কালের আবর্তে এদেশে অনেক কারুশিল্প হারিয়ে গেলেও ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি শিল্প স্বকীয়তা নিয়ে আজও টিকে আছে। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য শতরঞ্জি উৎপাদন এলাকার মানচিত্র দেখানো হলো।

BANGLADESH
Rangpur Shatranji Production Areas

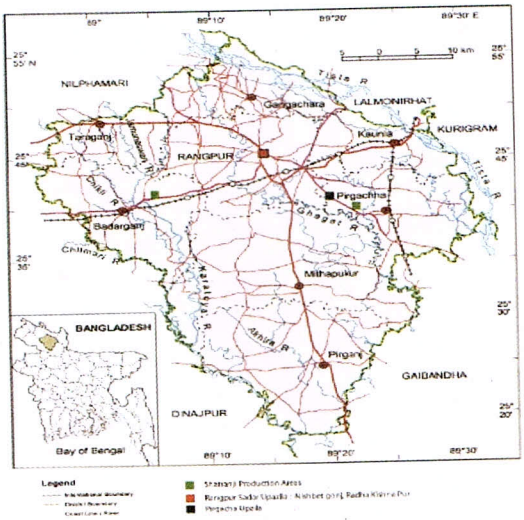

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ :

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের মধ্যে একটি হচ্ছে বয়ন শিল্প। আর এমনই একটি বয়নশিল্প যা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত তারই নাম শতরঞ্জি। ১৯১২ সালে প্রকাশিত রংপুর গেজেটিয়ারে ইতিহাসবিদ উইলিয়াম হান্টার উল্লেখ করেন ১৮৩০ সালের তদানীন্তন রংপুরের জেলা কালেক্টর মিঃ নিশবেত সরেজমিনে শতরঞ্জি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর নামকে ধারণ করেই উক্ত গ্রামের নামকরণ করা হয় নিশবেতগঞ্জ। ১৯১৩ সালে রংপুরের তদানীন্তন ডেপুটি কালেক্টর তাঁর রংপুর বিবরণী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রংপুর শহরের উপকণ্ঠে নিশবেতগঞ্জ গ্রামে ০৫ শতাধিক লোক শতরঞ্জি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। ব্রিটিশ শাসনামলে শতরঞ্জি এত বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, সে সময় নিশবেতগঞ্জের শতরঞ্জি রপ্তানি হতো ভারত, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াসহ ইউরোপের বিভিন্ন

দেশে। এখানে বংশ পরম্পরায় শত শত শ্রমিক, কারিগর ও পরিবার শতরঞ্জি তৈরির কাজে নিয়োজিত আছেন।

জানা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও রংপুর এলাকায় শতরঞ্জির প্রচলন ছিল। মোঘল সম্রাট আকবরের দরবারে শতরঞ্জি ব্যবহার করা হতো বলে ইতিহাসে কথিত রয়েছে। সম্রাট আকবরের সভাকক্ষে এবং ব্রিটেনের রাজদরবারেও তা শোভাবর্ধন করতো। তাছাড়া এ দেশে যে বস্ত্র ও বয়ন শিল্পের সুখ্যাতি ছিল তার প্রমাণ মেলে ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের লেখায়। বস্ত্রশিল্প যে এদেশের প্রধান শিল্প ছিল তা প্রমাণ রয়েছে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে। আরব, চীন ও ইতালিয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নীহার রঞ্জন রায়ের মতো দীনেশ চন্দ্র সেনও তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন, "বঙ্গদেশ বয়ন-বস্ত্র শিল্পের জন্মভূমি"। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বসরার যেমন গোলাপ, হিমালয়ের যেমন দেবদারু, বস্ত্র-বয়ন শিল্প তেমনই বঙ্গের নিজস্ব ঐতিহ্য। এ ক্ষেত্রে বাঙালির কোন প্রতিদ্বন্দ্বি নেই। আর রংপুর জেলার প্রাচীনতম ও গৌরবময় ঐতিহ্য হচ্ছে শতরঞ্জি শিল্প।

শতরঞ্জি পণ্যের একটা ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক ভিত্তি হচ্ছে আভিজাত্য। অতীতে আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের ঘরে এই শিল্প পণ্যটি দেখা যেতোনা। জমিদার পরিবারে শতরঞ্জি সামাজিক মর্যাদা ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বাংলোবাড়ি, খাজাঞ্চিখানা, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বসার স্থান, শয়নকক্ষ কিংবা বৈঠকখানায় সতের রঙের সুতায় বোনা শতরঞ্জিকে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আভিজাত্যের এই বর্ণনা পাওয়া যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রী দেবতা' উপন্যাসে। এখানে বর্ণিত রয়েছে যে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে শতরঞ্জি 'সোনার কৌটায় ভোমরা' হিসেবে সমাদৃত। রাজা-বাদশাদের প্রাসাদে এর ব্যাপক কদর ছিল।

ঝ) রংপুরের শতরঞ্জি (ম্যাট) উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

শতরঞ্জি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে প্রধানত চারটি স্তরে ভাগ করা যায়। (১) কাঁচামাল সংগ্রহ ও বুনন উপযোগী করার জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ (২) প্রাথমিক উৎপাদনের প্রস্তুতি (৩) প্রকৃত উৎপাদন ও নকশা (৪) উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বাজারজাত উপযোগী করা। সাধারণত তিন প্রকার শতরঞ্জি তৈরি করা হয়, যথা- (ক) সুতি (cotton) (খ) মখমল (woollen) (গ) পাট (jute)। প্রথমটি শতভাগ কার্পাস সুতার তুলা দিয়ে, দ্বিতীয়টি সুতা ও উলের মিশ্রণে মখমল দিয়ে এবং তৃতীয়টি পাটের সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়। শতরঞ্জি তৈরির প্রধান উপকরণ সুতলি (Shutholy)। স্থানীয় বাজার থেকে পাটের সুতলি, কটন সুতা ও উলেন জাতীয় বিভিন্ন ধরনের ফাইবার কিনে প্রয়োজন মতো রং করে শুকিয়ে নেয়া হয়। শুকনো সুতা টানা দেওয়া হয় বাশেঁর ফ্রেমে। টানার দৈর্ঘ্য সাধারণত দশ থেকে পয়ত্রিশ ফুট হয়ে থাকে। সুতা চরকায় বসানো হয় বান্ডিল তৈরি করার জন্য। শতরঞ্জি তাঁতে বা মেঝেতে বিছিয়ে নকশা অনুযায়ী সুতলির সাহায্যে হাতে বোনা হয়। হাতের কৌশলই শতরঞ্জি নির্মাণের ভিত্তি। তবে সুতার গাঁথুনি শক্ত করার জন্য পাঞ্জা ব্যবহার করা হয়। এভাবে শতরঞ্জি তৈরিতে নিয়োজিত প্রতিজন শ্রমিকের ০১ বর্গফুট শতরঞ্জি প্রস্তুতের জন্য সময় লাগে ০১ থেকে ০৩ ঘণ্টা। কোন জোড়া ছাড়া যে কোনো মাপের শতরঞ্জি তৈরি করা যায়। সাধারণত শতরঞ্জি আয়তাকার পরিমাপের হয়ে থাকে। তবে বর্গাকার ও ডিম্বাকারসহ যে কোন আকৃতির তৈরি করা যায়। এর সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য ৩০ ইঞ্চি ও প্রস্থ ২০ ইঞ্চি এবং সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট ও প্রস্থ ২০ ফুট পর্যন্ত যে কোন পরিমাপের বুনন হতে পারে। শতরঞ্জির আকৃতির বিষয় নির্ভর করে ক্রেতার চাহিদার উপর। এর শৈল্পিক সৌন্দর্য উল্লেখ করার মতো। এর কোন উল্টো-সোজা নেই, দুদিকেই ব্যবহার করা যায়। শতরঞ্জি তৈরির এ প্রক্রিয়া সাধারণত আলো-বাতাস সহজে প্রবেশ করতে পারে এমন অর্ধাবৃত ঘরে হয়ে থাকে। এভাবেই কেবল বাঁশ ও রশি দিয়ে সুতার টানা তৈরি করে প্রতিটি সুতার জ্যামিতিক মাপে গণনার মাধ্যমে হাত দিয়ে প্রস্তুত করা হয় শতরঞ্জি।

শতরঞ্জি তৈরিতে প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক শিল্পী/কারিগর কাজ করে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন নকশার শতরঞ্জি তৈরির জন্য সুতা চরকা থেকে খোলার পর শতরঞ্জি তৈরির টানা শুরু করা হয়। বাঁশ, রশি, পাঞ্জা, কঞ্চি, ফিতা ইত্যাদি শতরঞ্জি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। শতরঞ্জির ধরন/সাইজ, নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন রঙের সুতা ব্যবহার করে শতরঞ্জি তৈরি হয়। তৈরি শেষে শতরঞ্জির প্রান্তদ্বয় থেকে বাঁশকে ছাড়িয়ে নেওয়ার পর দুই প্রান্তে সুতা মুড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর কাঁচি দিয়ে সুতা কেটে শতরঞ্জি হালকা রোদে শুকানো হয়। এরপর ব্রাশ ও বান্ডিল করে শোরুমে অথবা গ্রাহকের কাছে বাজারজাত করা হয়।

১. প্রাকৃতিক রং এর পাটের সুতার বান্ডিল

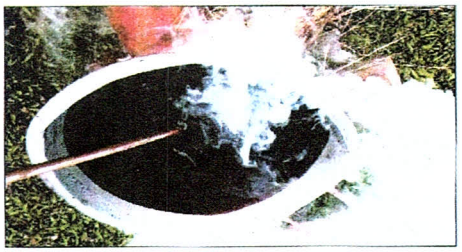

২. উনন জালিয়ে ড্রামে পানি দিয়ে রং মেশানো হচ্ছে।

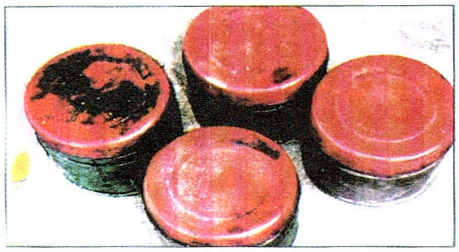

৩. রং ভর্তি চারটি কৌটা

৪. গরম পানিতে রং দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুতা রং করা হচ্ছে।

৫. রং করার পর পানি থেকে সুতা হাতে নেয়া হচ্ছে।

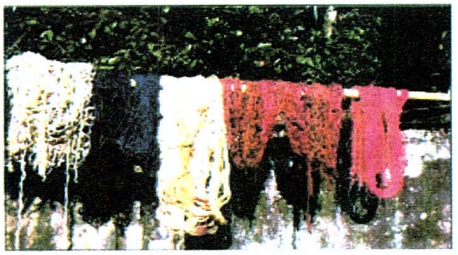

৬. রং করা সুতা রৌদ্রে শুকনো হচ্ছে।

৭. রৌদ্রে সুতা শুকানোর পর নিয়ে আসা হচ্ছে।

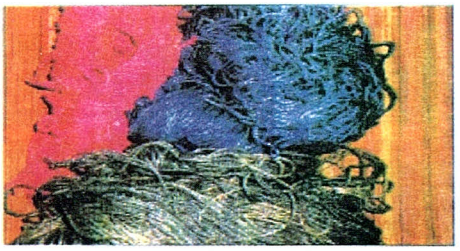

৮. রং করা সুতার স্তুপ।

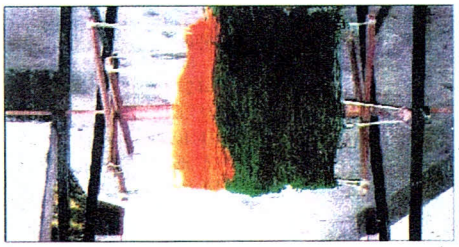

৯. রং করা সুতা কাটার জন্য চরকিতে আনা হয়েছে।

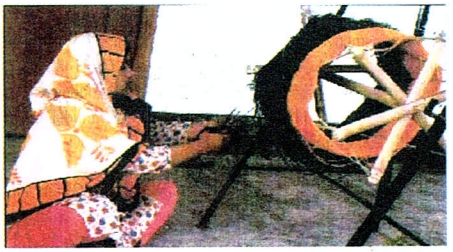

১০. চরকি থেকে সুতার কাঁটার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

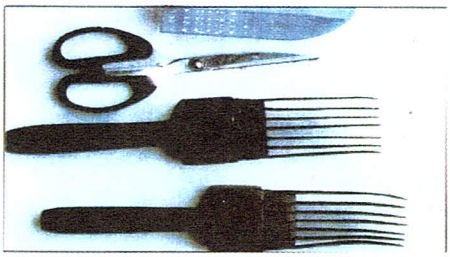

১১. শতরঞ্জি বুননের কিছু যন্ত্রপাতি: ব্রাশ, কাঁচি, পাঞ্জা ছোট ও বড়।

১২. শতরঞ্জি বুননের বিভিন্ন রকমের সুতা।

১৩. চরকিতে থেকে সুতা নামিয়ে নলি/মাকুতে ভরা হচ্ছে

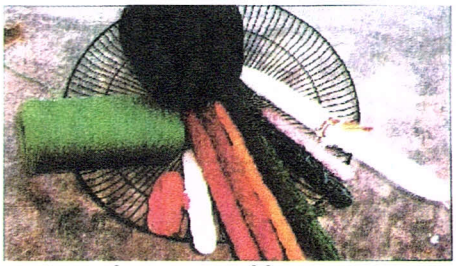

১৪. নলি/মাকুতে পেচানো বিভিন্ন রং এর সুতা।

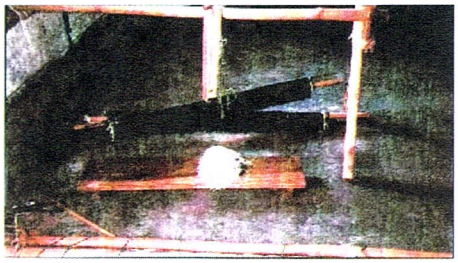

১৫. তাঁতের যন্ত্রাংশ বিশেষঃ কামান,পিড়ি, আগাল ও গোড়া কাঠ, জোঁ, সানা ইত্যাদি।

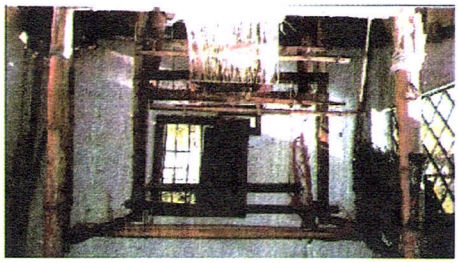

১৬. সম্পূর্ণ তাঁতের ছবি।

১৭. তাঁত সহ কাজে নিয়োজিত কারিগরের ছবি।
শতরঞ্জি বুননে সবছড়ি দিয়ে ঝাঁপির সাথে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে।

১৮. তাঁতে শতরঞ্জি ডিজাইন বুনন হচ্ছে।

১৯. পানজা হাতে টানায় ডিজাইন অনুযায়ী শতরঞ্জি বুনন হচ্ছে।

২০. সম্পূর্ণ একটি শতরঞ্জির ছবি।

ঞ) রংপুরের শতরঞ্জি (ম্যাট) বুননের কৌশল ও প্রক্রিয়া ঃ

শতরঞ্জি উৎপাদনে প্রথমে তাঁতে সুতা পরানো টানার এক প্রান্ত থেকে শতরঞ্জি বয়ন শুরু হয়। শতরঞ্জি মূলতঃ তাঁতে বুনন করা হয়। এর বয়ন অনেকটা সমান্তরাল (parallel) ধাঁচের। শতরঞ্জি বুননের তাঁত সাধারণ তাঁত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তৈরি কৌশল সহজ ও সরল এবং বৈচিত্র্যময়। তাঁত তৈরি করতে প্রথমত বাঁশ লাগে, যেমন বড় বাঁশ ও মূলী বাঁশ। সাধারণত যে পরিমাপের শতরঞ্জি তৈরি করা হয় তা থেকে এক ফুট বেশি দূরত্বে "গোড়া কাঠ" বসানো হয় এবং অপর প্রান্তে অর্থাৎ সামনের দিকে বসানো হয় "আগাল কাঠ"। অতঃপর গোড়া কাঠের একপ্রান্ত থেকে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুযায়ী দু-পরতে সমান্তরাল ধাঁচে সুতা অপর প্রান্তে বসানো আগাল কাঠে আটকানো হয়। এই সমান্তরালভাবে আটকানো সুতা শতরঞ্জি তৈরির মূল ভিত্তি, যার নাম "টানা"। টানার ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রস্থের দু'পাশে দৈর্ঘ্য অনুযায়ী মোটা রশি/দড়ি আগাল কাঠ ও গোড়ার কাঠের সাথে বাঁধা হয়। গোড়ার কাঠ তৈরিতে প্রস্থের এক ফুট বেশী একটি বড় বাঁশখন্ড এবং একটি মূলী বাঁশখন্ড বসানো হয়। এই দুই বাঁশখন্ডের মাঝখানে ছোট ছোট খুঁটি পেতে রশি দিয়ে বেঁধে গোড়া কাঠকে শক্তিশালী করা হয়। গোড়ার কাঠের বাঁশখন্ডের সাথে অপর প্রান্তে সামনের দিকে বসানো আগাল কাঠেও রশি দিয়ে আটকানো হয়। তবে এর সামনের দিকে কয়েকটি ছোট ছোট খুঁটির সাহায্যে কতগুলো রশি/দড়ি পেঁচানো থাকে, যা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে শতরঞ্জির মূল টানাকে শক্ত বা আলগা করা যায়। টানার এক পাশে ২টি কাচিয়া থাকে এবং ঝাঁপির সাথে শক্ত মোটা দড়ি দিয়ে এমন ভাবে একটি বাঁশ আটকানো হয় যা 'কামান' নামে পরিচিত। অতঃপর সুতা পরানো টানা এক প্রান্ত থেকে শতরঞ্জি বুননের কাজ শুরু হয়। আড়াআড়ি সুতা পরানোর জন্য পৃথক পৃথক তৈরিকৃত বিভিন্ন রং এর সুতার নলি বা গজমাকুর দ্বারা যা আড়াআড়ি ভাবে বয়ন করে নকশা তোলা হয়। একসারি আড়াআড়ি সুতা রান/বয়ন করার পর ঝাঁপি পরিবর্তন করা হয় অর্থাৎ কামান উঠানামার মধ্যদিয়ে উপরের ঝাঁপি নিচে এবং নিচের ঝাঁপি উপরে উঠানো হয়। টানার আড়াআড়ি নলি বা গজের একসারি সুতা পরানোর পর হাত আকৃতির পাঞ্জার সাহায্যে সুতাকে আরও নিবিড় (Compact) করে দেওয়া হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন কালারের (১৭ রকম) সুতা দিয়ে হরেক রকম ডিজাইন অনুযায়ী কারিগররা নানা রঙের নকশা ও বৈচিত্র্যে ভরে তোলে শতরঞ্জি। তাঁতে টানার সুতা লম্বালম্বিভাবে এবং ডিজাইনের ক্ষেত্রে মখমল সুতা আড়াআড়ি ভাবে ব্যবহার করা হয়। গ্রামীণ কারুশিল্পীরা কোনো প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই কেবল মাত্র নিজস্ব মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বংশ পরম্পরায় তৈরি করছে বিভিন্ন ধরনের শতরঞ্জি। শিল্পীর নিপুণতায় শতরঞ্জির নকশা হিসেবে এসেছে নারীর মুখ, পশুপাখি, রাখাল বালক, কলসি কাঁখে রমণী, নৌকা, রাজা-রাণী, দেব-দেবী, পৌরাণিক চরিত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি। এছাড়াও ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী শতরঞ্জির নকশা করা হয়। এসব নকশায় লাল, কালো বা নীল রঙের প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ট) রংপুরের শতরঞ্জি (ম্যাট) ডিজাইন ঃ

শতরঞ্জির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যই হচ্ছে ডিজাইন বা নকশা। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নানা ধরনের বাহারি নকশা শতরঞ্জি শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাচীন নকশাগুলোর মধ্যে হাতির পা, জাফরি, ইটকাঠি, নাটাই, রাজা-রাণী, দেব-দেবী, প্রজাপতি, ঘুড়ি, নারীর মুখ, রাখাল বালক, কলসী কাঁখে রমণী, বাঘবন্ধী, পালকি, মোড়া ফুল, জামরুল পাতা, রথ পাড়ি, দাবারঘর, লাইট, পৌরাণিক চরিত্র, নবান্ন, পৌষপার্বন, গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি শিল্পীর নিপুণতায় শতরঞ্জির নকশা হিসেবে এসেছে। শতরঞ্জি তৈরিতে সাধারণতঃ দুই ধরনের মোটিফ নকশায় ব্যবহার করা হয়। একটি প্রাচীন বা ঐতিহ্যবাহী নকশা এবং অপরটি আধুনিক নকশা। অভিজ্ঞ অনেক শতরঞ্জি বুনন শিল্পী মৃত্যুবরণ করায় এবং অনেকে এ শিল্পচর্চা ছেড়ে দেওয়ায় বুননশিল্পীরা প্রাচীন বা ঐতিহ্যবাহী নকশার পরিবর্তে বর্তমানে আধুনিক মোটিফের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। আধুনিক মোটিফে আছে উর্বরতা ও প্রবৃদ্ধির প্রতীক, পুষ্পিতপাতা, পানপাতা, ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনার স্বাক্ষর স্বরূপ কাবাঘর, মসজিদ-মিনার ইত্যাদি। এছাড়াও জীবন-জীবিকার প্রতীক মাছ, পাখি, নৌকা, কলসী কাঁখে বধু, গ্রামের দৃশ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদির চিত্র বুননশিল্পীরা শতরঞ্জি বুননের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেন। পরিবর্তনের ধারায় বর্তমানে জামদানি ও বালুচুড়ি শাড়ির নকশার মতো বুটিদার জরি ও তেরছি নকশাও স্থান পাচ্ছে। এছাড়াও ক্রেতার চাহিদানুযায়ী শতরঞ্জির নকশা করা হয়। আধুনিক নকশার ক্ষেত্রে বিবি রাসেলের উদ্ভাবিত নকশাও

উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত আছে রংপুরে বিভিন্ন এলাকায় ১৭ (সতের) রকমের রঙের সুতা দিয়ে হরেক রকমের ডিজাইন অনুযায়ী কারিগররা নানা ধরনের নকশা ও বৈচিত্র্যের ভরে তোলে শতরঞ্জি।

বর্তমান বিশ্বে বুনন শিল্পের মধ্যে শতরঞ্জি সবচেয়ে প্রাচীনতম। এ পণ্য উৎপাদনে যান্ত্রিক কোনো কৌশলের ব্যবহার নেই। কেবলমাত্র বাঁশের রশি দিয়ে মাটির উপর সুতা দিয়ে টানা প্রস্তুত করে প্রতিটি সুতা গণনা করে হাত দিয়ে নকশা করে শতরঞ্জি তৈরি হয়। বর্তমানে তাঁতি ও কারিগররা বিভিন্ন রঙে ও ঢঙে শতরঞ্জি বুনন করে যাচ্ছেন। কেবল পেশাগত দিক থেকে নয়, সৌন্দর্য বোধের বিষয়টি একজন শতরঞ্জি শিল্পীর কাছে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এটা শুধু তাদের পেশাই নয়, নেশাও বটে।

ঠ) সুতা রং করার প্রক্রিয়া ঃ

শতরঞ্জি তৈরিতে সুতা রং করা উৎপাদন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। শতরঞ্জির শৈল্পিক সৌন্দর্য ও চাহিদা বৃদ্ধিতে সুতার রং এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতার ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সুতাগুলোকে পানিতে সিদ্ধ করা হয়। সেদ্ধ করার সময় হাইড্রোজেন-পারঅক্সাইড, সিলিকেট ও কস্টিক সোডা মেশানো হয়। একটি বড় পাত্রে লবণ ও সোডা মিশিয়ে পছন্দ অনুযায়ী ভেষজ বা রাসায়নিক রং গুলানো হয়। এই গুলানো রঙের মধ্যে সিদ্ধ সুতা পানিতে পরিষ্কার করার পর ডুবিয়ে রাখা হয়। বড় পাত্র বা চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে রাখা সেদ্ধ সুতাগুলোকে আবার ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে রোদে শুকানো হয়। বর্তমানে এভাবে রংকরণ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র পাটের সুতার বেলায় প্রয়োগ করা হয়। কেননা বিভিন্ন রঙের সুতি ও মখমল সুতা বাজারে পাওয়া যায়। অবশ্য রং পছন্দ না হলে কিংবা নকশার প্রয়োজনে হরেক রঙের সুতা তৈরিতে নিজেরাই রঙ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। এতদিন ভেষজ রঙ (vegetable dye) বেশি ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে রাসায়নিক রঙ (Chemical dye) বেশি ব্যবহার করা হয়। ৬ থেকে ৯ টি রঙের ৪০ থেকে ৪৫ টি ডিজাইনের শতরঞ্জি বাজারে পাওয়া যায়। রঙ-বেরঙের সুতায়, প্রকৃতি নির্ভর গ্রামীণ নকশায়, কারুশিল্পীদের সুনিপুণ হাতে তৈরি হয় শতরঞ্জি। অতিসাধারণ উপাদানে কারুশিল্পীদের মনের মাধুরী মেশানো রঙের বহুবিদ ব্যবহার ও কারুকাজের সমন্বয়ে শতরঞ্জি শিল্প প্রস্ফুটিত। শতরঞ্জির সৌন্দর্যের প্রধান সোপান হলো বিভিন্ন রঙের সুতা ও কারুশিল্পীদের সুতার বুনন কৌশল।

ড) সুতা রং করার সময়সীমা ঃ

সুতা রং করতে ০১ থেকে ০৩ ঘণ্টা ধরে জ্বালানি কাঠ দিয়ে চুলায় তাপ দিতে হয়। লাল রং করার জন্য ১৮০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করতে হয়। হলুদ রং করার জন্য ০১ থেকে ০২ ঘণ্টা সময় লাগে। কালো রং করতে সময় লাগে ০৩ ঘণ্টা, ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা হলে ভাল হয়।

ঢ) রংপুরের শতরঞ্জি (ম্যাট) বুনন এর ট্যাপেস্ট্রির/ডিজাইন এর নাম ঃ

০১। হাতি পায়া
০২। ইট কাটি
০৩। প্রজাপতি
০৪। ঘুড়ি
০৫। বাকসো
০৬। মোড়া ফুল
০৭। আমরুল পাতা
০৮। রথপাড়ি
০৯। দাবারঘর
১০। কলসী কাঁখে বধু
১১। গ্রামের দৃশ্য
১২। নৌকা
১৩। জাফরি
১৪। লাইট

১৫। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
১৬। বিশিষ্ট জনদের ছবি
১৭। নারীর মুখ
১৮। রাজা-রাণী
১৯। দেব-দেবী
২০। রাখাল বালক

ণ) রংপুরের শতরঞ্জি (ম্যাট) তৈরিতে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়

০১। পাঞ্জা
০২। পিঁড়ি
০৩। বড় বাঁশ
০৪। মূলি বাঁশ
০৫। ইঞ্চি ফিতা
০৬। কাচি
০৭। দা
০৮। করাত
০৯। ব্রাশ
১০। খন্তা
১১। বয় কাঠ
১২। রশি মোটা, চিকন
১৩। ২ (দুই) সুতি রড ৩ ফিট (চরকা বানাতে)
১৪। পাটের সুতলি
১৫। হাতুড়ি ও বাটালি
১৬। টানার সুতা
১৭। সরছড়ি
১৮। পানাবান
১৯। কাচিয়া
২০। কামান
২১। আরকা

ত) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

রংপুরের ঘাঘট নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার জলবায়ু এবং ঘাঘট নদীর পানি শতরঞ্জি বুননের উপযোগী। বিশ্বের অন্য কোথাও এ শতরঞ্জি বুনন হয় না। ঘাঘট নদীর পানির সাথে রং মিশিয়ে কটন সুতা ও পাটের সুতা রং করা হয়, যার ফলে সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা এবং রং এর স্থায়ীত্ব অনেক বেশী থাকে। শিল্পীর নিপুণ হস্তদ্বারা এবং নিজস্ব কল্পনা থেকে (রংপুরের শতরঞ্জি কারুশিল্পীদের) বিভিন্ন ডিজাইনে তৈরি হয় শতরঞ্জি (ম্যাট)।

থ) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক, কেলাবন্দ, রংপুর।

দ) ব্যবহারকাল ঃ

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন জেলা প্রশাসক মিঃ নিশবেত এর সময়ে নিশবেতগঞ্জ গ্রামে প্রথম এ শিল্প চালু হয়। জনাব নিশবেত এর নামানুসারে এ গ্রামকে নিশবেতগঞ্জ গ্রাম বলা হয়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রংপুর জেলায় এ পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার চলমান রয়েছে। (সূত্রঃ বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, রংপুর, ১৯৯০)।

ধ) অন্যান্য ঃ

বিসিক কর্তৃক পরিচালিত শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন (নিশবেতগঞ্জ, রাধাকৃষ্ণপুর) প্রকল্পে বর্তমানে ৪৫৩টি কারখানা চালু রয়েছে।

রংপুরের শতরঞ্জি

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-প্রসেস শাখা-৬৯৭/২০-২১/শিল্প-১৩-১২-২০২০-১২০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Md. Asaduzzaman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Maksuda Begum Siddika, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.